Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIV Issue : II, 15th, May, 2024 ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

১৪৩১ এর প্রথম মাসে দুঃসহ দাবদাহে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। শ্বাসে-জলে লালিত বাঙালিরা এই উত্তর ভারতীয় শুষ্ক গরমে অভ্যস্ত নয়। পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নগরায়নের দিকে ছুটছি, ফলে স্বখাত সলিলে ডুবে মরেছি।

এই চরম শারীরিক কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারে ২৫ বৈশাখ! সমস্ত দুঃখ-বেদনা ভুলে, দাবদাহ উপেক্ষা করে আপামর বাঙালি মেতে উঠবে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে। আগামী এক পক্ষ বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হবে রবীন্দ্র সঙ্গীত - কবিতা - নাটকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানে তো শুধুই গান, কবিতা বা নাটক নয়। তাঁর আদর্শ-মনন-চিন্তাকে অস্বীকার করে বা ভুলে গিয়ে জন্মোৎসব পালন দ্বিচারিতা নয় কি! রবীন্দ্রনাথের জীবন বেদ, সাহিত্যের মূল সুর মানবতাবোধ। তিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা এবং বিভাজন বিরোধী। দুটি মাত্র কবিতা আমরা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরতে পারি।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির / জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর / আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশবরী / বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,/'

কিংবা

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন -/ শক-হুন-দল-পাঠান মোগন এক দেহে হল লীন।/' আমরা তো এখন আর ভারতবাসী নই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ভাগে ভাগ হয়ে আছি। আবার হিন্দুর মধ্যেও কত ভাগ। প্রধানমন্ত্রী বলেন আমিষ খাওয়া নাকি মোগল সংস্কৃতি। এখন আপনি মোদির সমালোচনা করলে হয়ে যাবেন দেশদ্রোহী, আবার দিদির সমালোচনা করলে হবেন বাংলা বিরোধী। তাই ভয়শূন্য চিত্ত বা উচ্চশির এখন আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

এই মে মাসে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মদিন। যিনি বলেছিলেন 'হিন্দু না মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন', অথচ সাম্প্রতিক নির্বাচনে এটাই একমাত্র ইস্যু! তাই নজরুলকেও আমরা 'ফিরাই ব্যর্থ নমস্কারে'।

বাচালনামা

ইতিহাস কিংবদন্তি লোকবিশ্বাসের দেশ চন্দ্রকেতু গড় ও বালান্দা

গাজী মহম্মদ আবুবকর

ছিল ২৪ পরগনা, তার ওপর প্রশাসনিক কোপ বসিয়ে তৈরি হয়েছিল জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। মাত্র আটত্রিশ বছর আগের ঘটনা। বর্তমানে এই জেলার পুবদিকে দেগঙ্গা, বেড়াচাম্পা, বাদুড়িয়া, ধান্যকুড়িয়া, রুদ্রপুর, লক্ষীনাথপুর, পুনরো, টাকি, উত্তরে গোবরডাঙা। ব্রিটিশ আমলে এসব এলাকায় দবদবা ছিল জমিদারদের। তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন সফল হয়নি। তারপরও ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ চলেছিল ১১৬ বছর।

টাকির জমিদার কাশীনাথ রায় (মুনসী) ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভুত উন্নতি করেছিলেন টাকি টু কলকাতা সড়কপথ নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে মার্টিন কোম্পানির কু-ঝিক-ঝিক রেলপথ খোলার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন বসিরহাটের এক সুসন্তান স্যার আর এন মুখার্জি।

জেলার দুইদিকে দুই বহতা নদী ইছামতী আর বিদ্যাধরী, ব্যবসা বাণিজ্য চলমান রাখার সহজ উপায়।

বর্তমানে এসে গেছে দ্রুততার যুগ। দ্রুতগামী ট্রেন বাস মিনি অটো টোটো ভ্যানে করে মানুষ নিত্যদিন জেলা এফোঁড় ওফোঁড় করে মহানগরী পর্যন্ত যাতায়াত করছে। চলছে গ্রামের সঙ্গে শহরের নিত্য ওঠাবসা।

সাম্প্রতিকালে বেড়াচাম্পা হাড়োয়া এলাকায় মাটি উৎখনন করে পাওয়া গেছে শতসহস্র বছর আগের উন্নত সভ্যতার প্রচুর প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন, শুঙ্গ-কুষাণ-মৌর্য যুগের, হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলামী ধর্মের অনেক নমুনা ও স্মৃতি চিহ্ন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা আর ঐতিহাসিকরা ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করছেন কিভাবে ইতিহাসের পাতা পরপর সাজানো যায় এবং প্রত্ন-সামগ্রীগুলিকে অর্থবহ রূপে দাঁড় করানো যায়।

দু-জন প্রত্ন-বস্তু প্রেমী সংগ্রাহকের নাম উল্লেখ না করলে এই লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। দিলীপকুমার মৈতে (১৯৩৬-২০১৮) এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্বত:প্রণোদিত হয়ে করে গেছেন জীবনভর। তাঁরই সংগৃহীত সমস্ত প্রত্ন-সামগ্রী স্থান পেয়েছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন চন্দ্রকেতু গড় মিউজিয়ামে। দ্বিতীয়জন— হাড়োয়া এলাকার প্রগতিশীল যুক্তিবাদী চিন্তার ধারক, এম এ জব্বার, যিনি নিজের গৃহেই একটি অসাধারণ প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। তার অস্তিত্ব বিদ্যামান আজও আছে, তবে সঙ্কটমুক্ত নয়। গত শতাব্দর আশির দশকে আমি সংগ্রহশালীটি দেখে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে জব্বার সাহেবের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম, অথচ মানুষটি তখন দৃষ্টিহীনতায় ভুগছেন। যাইহোক,

১৯৮৮-তে তিনি প্রয়াত হবার পর তাঁর একমাত্র জামাতা, আজিজুর রহমান সংগ্রহশালা দেখভাল করতেন। বলা বাহুল্য, তিনিও শিক্ষায় চেতনায় উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কয়েকটি বইয়েরও প্রণেতা ছিলেন। ২০১১-এ তিনিও গত হয়েছেন। বর্তমানে সংগ্রহশালাটির পরিচালনার বিষয়টি এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবার জানাই কোথায় কোথায় ঘুরলাম, কী কী দেখলাম! বাস্তবিকপক্ষে, সবকিছু লিপিবদ্ধ করা কঠিন যা ফটোর সাহায্য নিয়ে করা সহজ। সেক্ষেত্রেও আছে সীমাবদ্ধতা। চন্দ্রকেতুগড় মিউজিয়ামে ফটো তোলা নিষেধ তবে খোলা আকাশের নিচে অনতিদূরের চন্দ্রকেতুগড় দেখা গেল। ওটাই বুঝি খনা-মিহিরের ঢিবি! এরপর গন্তব্য হাড়োয়া। সেখানে এম এ জব্বারের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সারাজীবন ধরে গড়ে তোলা বালান্দা প্রত্ন-সংগ্রহশালা। জব্বার সাহেবের বর্তমান প্রজন্মের উত্তরপুরুষ মোমিনুর রহমানের সৌজন্যে সমস্ত প্রত্নসামগ্র চাক্ষুষ করলাম। দেখা হল জরাজীর্ণ লাল মসজিদ। সে যেন এক ধ্বংসস্তূপ। কতকাল আগে তৈরি কেউ জানে না। কারও কারও অভমত, এটা ছিল বৌদ্ধদের বালান্দা স্তূপ। তবে বর্তমান লাল মসজিদ চত্বরে ইদ ও বকরীদের জামাতের নামাজপাট হয়। অদূরে এক বিশেষ প্রজাতির বাঁশের ঝোপঝাড়। বিশ্বাসীরা মনে করে, জিন্দাপীর গোরাচান্দের হাতের ব্যবহৃত বাঁশের লাঠি থেকে এই কাঁটাওয়ালা বাঁশের উৎপত্তি। এখানে পীরের মাজার সদৃশ একটি সংরক্ষিত স্থানও আছে।

পরিশেষে, মন্থরগতি বিদ্যাধর নদীর তীরে দেখলাম পীর সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে গোরাই গাজী ওরফে গোরাচান্দ পীরের মাজার শরীফ। পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে এক অসাম্প্রদায়িক তীর্থস্থান। এখানে প্রতি ফাল্গুনে ১১-১৩ তারিখে উরস উৎসব হয়, মেলা বসে। বার হয় 'সোন্দল' (শোভাযাত্রা), মনস্কামনা পূরণের জন্য অনেকে পীরের কাছে মানত করে, আবার মনস্কামনা পূরণ হলে "হাজুত" করে। তবে বিশ্বাসের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। অনেকেই পীরতন্ত্র বিরোধী মত পোষণ করে। এ সব কাজকে শেরেক (শির্ক), অর্থাৎ এ ক্রিয়াকলাপ নেহাত লোকাচার, এতে ধর্মীয় অনুমোদন নেই। তবে এ সব কূটকচালি উপেক্ষা করে বলা যায়, এখানে কখনো অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এক গঞ্জ ও বাজার।

চতুর্দশ শতকে আরব থেকে একদল ধর্মপ্রচারক এদেশে এসেছিলেন। এঁদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সৈয়দ আব্বাস আলী। তিনি কোনো ভাবে ধর্মান্তরকরণ নিয়ে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়ে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিলেন। তবে আজও বহুলোক বিশ্বাস করে পীর গোরাচান্দ ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক সুফীসন্ত।

চন্দ্রকেতুগড় মিউজিয়ামে ছবি তোলা নিষেধ থাকলেও দেখার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সেখানে যা যা দেখলাম তার মধ্যে এক ধরনের মৃৎপাত্র আছে, ফানেলের মতো দেখতে, তৈরি হয়েছে কুমোরের চাক ঘুরিয়ে। এগুলির মধ্যে সুরা বা তেলের মতো তরল পদার্থ সঞ্চয় করে রাখা হতো। ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে এ অঞ্চলের সমুদ্রপথে যোগাযোগর সাক্ষ্য বহন করে এইসব পাত্র— বিশেষজ্ঞদের এমনই অভমত। মিউজিয়ামে আরও দেখা গেলো পশুর মুখওয়ালা খেলনা গাড়ি, মিথুন মূর্তি, নানান ধরনের ইট,

রংবেরংয়ের পুঁতির গয়না, তার মধ্যে পোড়ামাটির পুঁতিও আছে। কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা, সীলমোহর, নৃতরতা রমণী, হাড়ের তৈরি জিনিসপত্র, পোড়ামাটির ফলকে নবান্ন উৎসব, হস্তী আরোহী, যক্ষী, উমা-মহেশ্বর, পোড়ামাটির ওজন পরিমাপক ইত্যাদি। চন্দ্রকেতুগড় নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে থাকেন দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। ১৯৫৭ সালে এই স্থানকে প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়। সম্পূর্ণ এলাকায় উৎখনন করে এক চাপাপড়া প্রাচীন নগর সভ্যতার নিদর্শনের হদিশ মেলে। খনা-মিহিরের ঢিপি হিসেবে অনুমান করেন অনেকে। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে আরও অনেক স্থানের সন্ধান মেলে। যেমন— হাদিপুর, হামাদামার নাম উল্লেখ করা যায়। তবে এইসব এলাকায় কিংবদন্তি, লোককথা, প্রচলিত লোকবিশ্বাসের ছড়াছড়ি। এগুলোর মধ্যে কোনটা ইতিহাস আর কোনটা ইতিহাস নয়— এসব ধাঁধার নিষ্পত্তি হওয়ার সহজ নয়। বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা এম এ জব্বার সাহেব ততদিন জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন (মৃত্যু-১৯৮৮) এই সংগ্রহশালা নিয়ে প্রচুর আলোড়ন হয়েছিল। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, ঐতিহাসিক, প্রত্নবিদ, গ্রন্থপ্রণেতা, বেতার ও টেলিভিশনের প্রযোজক, উৎসাহী সাধারণ মানুষের আনাগোনা লেগেই তাকতো। সকলেই জব্বার সাহেবের প্রশংসা করতেন মুক্তকণ্ঠে। তাঁর ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, প্রত্নসামগ্রীর ভেতর থেকে প্রকৃত সত্য উন্মোচনের নিখাদ ব্যাকুলতা। তবে বহু প্রত্নবস্তু বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, এবং সেগুলো কোনো মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে না কোনো সৌখিন বড়লোকের ড্রয়িংরুমে শো-পীস হিসেবে বিরাজ করছে সে খবর আর কে রাখে! বর্তমানে এই সংগ্রহশালার হল একটা গুদাম ঘরের মতো বলতে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেকটি প্রত্নসামগ্রী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে গেলে এবং বর্গীকরণ করতে হলে অনেক লোকবল ও বিশাল পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন। সংগ্রহশালাটি নিয়মিত খোলা রাখতে হলে মিউজিয়ামের গাইডের মতো উপযুক্ত কর্মী চাই। প্রশাসনের লোকেরা, রাজনৈতিক নেতারা নাম কে ওয়াস্তে লিপ সার্ভিস দেন, নানান রকম আশ্বাস দেন। কিন্তু কাজেরকাজ কিছু হচ্ছে না। এই উদ্বেগ ও হতাশা লক্ষ্য করলাম মোমিনুর রহমানের কণ্ঠে (জব্বার সাহেবের নাতি), যিনি আমাকে সংগ্রহশালাটি দেখার সুযোগ করে দিলেন।

বিছানা ভেজানো : আকুপাংচারে নিরাময়

ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত

মোবাইল : ৯৮৮৩১২০৭৬১

প্রকৃতি মানুষের শরীরকে এমনভাবে তৈরি করেছে, যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় কাজ সম্পন্ন করতে একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বা তালমিল দরকার হয়। যেমন মূত্রত্যাগ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শরীর থেকে অতিরিক্ত জলসহ অপরেয়োজনীয় রেচন পদার্থ বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতিটি সম্পন্ন হতে মূত্রনালী, মূত্রথলির সঙ্গে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে তালমিল প্রয়োজন হয়।

সাধারণত শিশুদের ছ'-সাত বছর বয়স অবধি মূত্রত্যাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে না। ফলে এই সময় শয্যামূত্র বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে অন্য সময় মূত্রত্যাগও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আর একটু বেশি বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এটি অস্বাভাবিক এবং নিশ্চিতভাবেই কোনো রোগের সঙ্কেত দেয়। শয্যামূত্র সাধারণত রাতে ঘুমের মধ্যেই হয়ে থাকে। মেয়েদের চেয়ে ছেলে-শিশুদের মধ্যেই এটা বেশি দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে রোগটির পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত শিশুদির বাবা বা মা অথবা দু'জনেই শিশু অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত মূত্রত্যাগের রোগী ছিলেন বলে দেখা যায়।

শয্যামূত্রের কারণ

রোগটির নির্দিষ্ট কোনো কারণ অনেক সময়েই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকে। সেগুলোকে এক এক করে দেখা যাক—

- কিছুক্ষেত্রে শিশুর জন্মগত ভাবে ছোট মূত্রথলি বা দুর্বল পেশিযুক্ত মূত্রথলি থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রার মূত্রও মূত্রথলি ধরে রাখতে পারে না।
- অনেক সময় ছ'-সাত বছর বয়সের পরও মূত্রত্যাগের ওপর নার্ভ বা স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে না। বিশেষ করে যে সব শিশু রাত্রে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে তাদের মূত্রত্যাগের সঙ্কেত মস্তিষ্ক থেকে মূত্রথলিতে পৌছবার আগেই শয্যামূত্র হয়ে যায়।
- মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন সঠিক বা উপযুক্ত মাত্রায় তৈরি না হলে শয্যামূত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- কখনও কখনও মানসিক চাপ বা ভীতি শয্যামূত্র ঘটাতে পারে। যেমন নতুন স্কুলে যাবার ভয়, বাড়ি থেকে দূরে একা থাকার ভয় ইত্যাদি শিশুর ওপর মানসিক চাপ তৈরি করে। যা মূত্রত্যাগের প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত করে।
- মূত্রঘটিত সংক্রমণ অন্যতম কারণ।
- ঘুমের সমস্যাতেও শয্যামূত্র হতে পারে। স্লিপ অ্যাপনিয়া নামক ঘুমের একটি সমস্যা শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। এটিতে ঘুমের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়। সঙ্গে নাক ডাকা, গলার সমস্যা, টনসিলের সমস্যাও থাকতে পারে। এটাতে শয্যামূত্র হবার সম্ভাবনা থাকে।
- ডায়াবেটিস, মূলত টাইপ-ওয়ান ডায়াবেটিস শয্যামূত্রের অন্যতম কারণ।
- যে সব শিশুর নিয়মিত পায়খানা হয় না বা যাদের নিয়মিত পায়খানার অভ্যেস নেই তাদের ক্ষেত্রেও শয্যামূত্র দেখা যেতে পারে।

শয্যামূত্রে আকুপাংচার

এই রোগটির ক্ষেত্রে প্রথম দেখার বি,য় হল, রোগটির পেছনে সম্ভাব্য কারণটি কী। একজন দক্ষ চিকিৎসক জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রয়োজনে হাতে বা যন্ত্রের মাধ্যমে কারণটা খুঁজে পেতে পারেন। কারণটা যদি আকুপাংচার দ্বারা চিকিৎসাযোগ্য হয় তবে সহজেই আকুপাংচার করা যেতে পারে। অনেকের মনে হতে পারে সুঁচ ফুটিয়ে কি শিশুদের চিকিৎসা করা হবে? এটা তো নিশ্চয়ই খুব কষ্টদায়ক? সবসময় শিশুদের সুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয় এমন নয়। নির্দিষ্ট কিছু বিন্দু (যা চামড়ার ওপর অবস্থিত)-তে চাপ দিয়ে বা মক্সা চুরুটের (এক প্রকার ভেষজ) গরম

সেঁক দিয়েও শিশুদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে সম্ভব হলে দু'থেকে পাঁচটি সুঁচ উপযুক্তভাবে পরিশোধন করে ফোটালে দ্রুত ফল পাওয়া যায়। দক্ষ হাতে সুঁচ ফোটালে একটুও ব্যথা লাগে না। চিকিৎসা শুরুর দিকে খুব ঘনঘন কিছু দিন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। পরের দিকে ক্রমশ দুটো চিকিৎসার মাঝের সময় বাড়তে থাকে। আকুপাংচার চিকিৎসা মূত্রত্যাগের স্বাভাবিক পদ্ধতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে নার্ভ বা স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে। হরমোন তৈরির পদ্ধতিকেও স্বাভাবিক করে। এই চিকিৎসার পদ্ধতি খুবই সরল এবং বাইরে থেকে কোনো রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয় না। সুঁচগুলো চুলের মতো সূক্ষ্ম এবং প্রতিবার ব্যবহারের আগে পরিশোধিত করা হয়, তাই সংক্রমণের ভয় থাকে না।

নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চিকিৎসা করালে শয্যামূত্র থেকে শিশুদের মুক্ত করা সম্ভব। একই সঙ্গে এটাও বলার যে রোগটা নিরাময় করতে শিশুর বাবা-মা'কে ধৈর্য সহকারে শিশুকে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। নির্দিষ্ট সময় মূত্রত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এবং শিশু যাতে ভীত হয়ে না পড়ে সেজন্য তাকে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে।

স্বপ্ন - সত্য বনাম বাস্তব

ছায়া মুখার্জি

লিখবো কি লিখবো না। বলবো কি বলবো না। আর বললেই বা কতটুকু বলবো। লিখলেই বা কতটুকু লিখবো— এই দ্বিধা-দ্বন্দ নিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখতে বসে গেলাম।

আমাদের বিশ্বে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন কোনোটা বাস্তবায়িত হয়। আবার কোনোটা শুধু স্বপ্নই থেকে যায়।

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং (১) যখন বন্ধ হয়ে মল তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনই বিমল চ্যাটার্জি তাঁদের ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ভবনটিকে সামাজিক কাজে এবং বরিষ্ঠ নাগরিকদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য এক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়— নরম্যান বেথুন ইনস্টিটিউ রিসার্চ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। সারাবছর ধরেই বরিষ্ঠদের মানসিক ও শাররিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য নানাবিধ কর্মকাণ্ড চলতেই থাকে। বিমলদা (বিমল চ্যাটার্জী) এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে ছিলেন। স্বপ্ন দেখা দুই রকমের হয়। এক ব্যক্তিগত স্বপ্ন আর অন্যটি অবশ্যই সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত স্বপ্ন বেশিরভাগ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আর যে স্বপ্নে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ওই গোষ্ঠীর অন্যান্য মানুষের স্বপ্নের মিলন ঘটে— সেটাই তখন বাস্তবে রূপদানে এক ঐকাতিক প্রচেষ্টা চলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিমলদার স্বপ্নের সঙ্গে হাত বাড়িয়েছিলেন অঞ্চলের অসংখ্যা চিকিৎসক। ডা. জি.পি, ডা. গুছাইত দত্ত, ডা. বিজয় বসু, ডা. পি.এস.সাহা, ডা. গাঁতাইত, ডা. শীল এবং ডা. এ.কে. ব্যানার্জী (এফ.আর.সি.এস) প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা। এছাড়াও ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সহমর্মিতা। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ড চলমান করতে একটা পরিচালন সমিতিরও দরকার হয়ে পড়ে। অন্যান্য কর্মীবৃন্দের যাঁদের

মধ্যে এমন মানবিকতা আছে প্রবীণ মানুষদের জন্য তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যাতে কিছুটা দুঃখ-দুর্দশা দূর করে আনন্দে রাখা যায়। সেই রেশ টেনেই কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পেলব মুখার্জী, স্নেহাংশু চাকদার, উমা সাহা, ডা. বীরেন মজুমদার। পরবর্তীকালে নীরেন চ্যাটার্জী, সুশীল রায়, দীক্ষিত, মনোজ রায়, দেবু দত্ত, নারায়ণ ঘোষ, রবীন ঘোষদস্তিদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম। বর্তমান সম্পাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন গৌতম রায়চৌধুরী। উনিও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বুদ্ধি এবং শ্রম দিয়ে সংস্থাকে আরও জনমুখী করার প্রয়াসে। তিনি অন্যান্য কর্মসূচীর পালনের সঙ্গে অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের পঠন-পাঠন বিষয়ক দ্রব্যাদির প্রদানে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধনের সঙ্গে বেথুন ইনস্টিটিউটের পরিচিতি আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। অবশ্যই এ কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগে মাঝে মাঝেই ন্যাশনাল মেডিকেল, এন.আর.এস এবং মেডিকেল হাসপাতাল থেকে বিনা পারিশ্রমেকে চিকিৎসকরা সাধারণ স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, দাঁত, চোখ এবং অর্থপেডিক চিকিৎসার জন্য ক্যাম্প করতো বেথুনে।

বেথুন কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। এটি প্রবীণদের একটা সামাজিক মঞ্চ। কোনো মঞ্চই একই ভাবে স্থির থাকতে পারে না। খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাদের সমাজের পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই সংস্থাকেও ব্যক্তি বা কোনো অন্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে (অবশ্যই সমমনস্ক) আরও প্রাণবন্ত ও সংঘটিত করা সম্ভব। এখন আমাদের সমাজে এক অভিনব আত্মত্যাগের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্যক্তি স্বয়ং কর থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং নিজ নামের ব্যাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে নিজের গাড়ি নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ে, অন্ধ বিদ্যালয়ে, অনাথ আশ্রমে এবং লোকালয়ে দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং অর্থ প্রদান করেছেন। এভাবে ব্যক্তি মানুষের সমাজে সঠিক অস্তিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।

কলকাতার বরিষ্ঠ নাগরিকদের অবস্থা খুবই করুণ। তাদের বাড়িঘর থাকলেও প্রত্যেক পরিবারে একটি বা দুটো সন্তান। অনেকেই জীবিকার উদ্দেশ্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। সেখানে অতি ব্যস্ততার মধ্যে পিতামাতার খোঁজখবর নেওয়া প্রায় অসম্ভব। আরেকটি অংশ বেকারত্বের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বিপথে পা বাড়াতে দুবার ভাবছে না। কেউ বা শুধুই বসে বসে অর্ধাহারে দিন কাটিয়ে চলেছে। সল্টলেক বসতিদের মধ্যেতো প্রবীণরাই এখন প্রাধান্য পাচ্ছে। তাঁদের খুবই করুণ অবস্থা। লুঠতরাজ তো চলছেই। খুনও চলছে অবাধে। এছাড়া গোটা কলকাতা উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় সব এলাকায়ই বস্তাবন্দি বৃদ্ধদের দেহ অথবা ঘরের আপন জনের হাতে মৃত্যু বা ঘরের ভিতর পড়ে থাকা পচাগলা দেহ। এ কোন কলকাতায় আমরা বাস করছি। এমন চিত্র তো আগে কখনোই দেখা যেতো না। কলকাতায় তো মানুষদের স্বাধীনভাবে, খোলামেলাভাবে বাঁচার অধিকার ছিল।

অথচ দেশে ও রাজ্যে জ্ঞানগম্ভীর ভাষায় প্রচারে বলা হচ্ছে দুই শক্তিশালী মন্ত্রীদের প্রকল্প ও যোজনার ছড়াছড়ি। এদের কতটা কার্যকরী হচ্ছে বা হবে তা বোঝার সাধ্যি কার? তবে শহরাঞ্চলের ব্যাপ্তি বেড়েছে সঙ্গে চাকচিক্য বেড়েছে অবশ্যই।

কিন্তু যে মানুষগুলি সারাজীবন ধরে দেশের জন্য এবং সমাজের জন্য করে গেলেন তাদের কী এভাবেই মরতে হবে? এটাই কী ভবিতব্য। তাহলে কী এই প্রজন্ম শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য

জীবন কাটাচ্ছে? আমার তা মনে হয় না। পাঁচজন মানুষ তো কিছুটা হলেও সমাজের কথা ভাবেন। আমি বলবো গুটি গুটি পায় তারা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বেথুনে আসুন। এখানে খুবই অল্প চাঁদায় সদস্যপদ প্রদান করা হয়। আর সঙ্গে থাকে মাসিক প্রবীণবার্তা। এই প্রবীণবার্তা ডাকযোগে এবং হাতে হাতে সকলের কাছে পৌছে দেওয়া হয়। প্রচুর সদস্য/সদস্যা আছেন। তাঁরা নিয়মিত বেথুনের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রায়ই দোতালার বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে উপচে পরা ভীড় হয়। প্রবীণরা এখানে মানসিক আনন্দ পান। মনের মতো বন্ধু পান সঙ্গে পান কীভাবে সুস্থভাবে বাঁচা যায় তার পরামর্শ। থাকে বনভোজনের ব্যবস্থা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাটকের বেশ মননশীল ব্যবস্থা। কর্মসূচীগুলি পালনে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা সবচেয়ে আগে প্রাধান্য পায়। কলকাতার আশেপাশে বৃদ্ধাবাস ছাড়াও প্রবীণদের জন্য এ রকম বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। তবে যেমনই আর্থিক ব্যয়সাধ্য তেমনই এমন সুন্দরভাবে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট নয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমাদের সদস্য গ্রহণ চলছে। যারা এখনও সদস্যপদ গ্রহণ করেননি তাঁদের অনুরোধ করছি যে আপনারা সদস্য/সদস্যাপদ গ্রহণে এগিয়ে আসুন। যে কোনো বয়সের নাগরিকরাই সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের বোর্ড সংগঠনের প্রথম থেকেই রয়েছে অশোকবাবু ও রমাপদবাবু এবং অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

এই সংস্থাকে সজীব রাখতে আর্থিক সাহায্য ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ সহয়তা একান্ত প্রয়োজন। পি.আর.সি এর সহযোগিতায় প্রবীণ জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আশা করি সরকারি প্রশাসক সংস্থার বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ এবং অঞ্চলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে বেথুন ইনস্টিটিউ এক শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত প্রবীণ সংস্থা রূপে চির স্মরণীয় হয়ে বিরাজ করবে।

প্রবীণবার্তায় প্রকাশিত লেখা

এপ্রিল ২০২৩ - মার্চ ২০২৪

১) অমল কর : ক) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মনে রেখে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩
খ) অপরাহত মানুষ। মার্চ, ২০২৪

২) অশোক রঞ্জন ধর : প্রবীণ নিগ্রহ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা। জুন, ২০২৩

৩) আশিস সান্যাল : একদিন। মার্চ, ২০২৪

৪) খগেশ্বর দাস : মুক্তি। মার্চ, ২০২৪

৫) গাজী মহম্মদ আবুবকর : ক) বাচালনামা - পার্ক নার্সিংহোমে শরৎচন্দ্রের অন্তিম দিনগুলি। জুলাই, ২০২৩
খ) বাচালনামা - খুশির আলোয় ঈদ্-উল-জোহা। আগস্ট, ২০২৩
গ) বাচালনামা - খাসি পাড়ার করম পরব। অক্টোবর, ২০২৩
ঘ) বাচালনামা - বেথুন ইনস্টিটিউটের চমৎকৃত প্রয়াস। নভেম্বর, ২০২৩
ঙ) বাচালনামা - একাকিনী নার্গিস সাত্তার। ডিসেম্বর, ২০২৩

চ) বাচালনামা - সাবধানের মার নেই। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
ছ) কবির ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। মার্চ ২০২৩

৬) গীতালী চক্রবর্ত্তী : ফিরে দেখা নক্ষত্র। নভেম্বর, ২০২৩

৭) ড. গোবিন্দ মাইতি : ক) সিঙ্গাপুরে কয়েকটা দিন। ডিসেম্বর, ২০২৩
খ) ত্যাগ। মার্চ, ২০২৪

৮) গৌতম রায় চৌধুরী : ক) আবোল তাবোল। ডিসেম্বর, ২০২৩
খ) বেথুন ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন। মার্চ, ২০২৪

৯) ছায়া মুখার্জী : সুন্দরবনের সুন্দর রূপ। অক্টোবর, ২০২৩

১০) ডা. জ্ঞানব্রত শীল : সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আগস্ট, ২০২৩

১১) ঝুমা সরকার : কবিতার পথে। মার্চ, ২০২৪

১২) তপন কুমার দাস : ক) চন্দ্রযান-৩। আগস্ট, ২০২৩
খ) বিজ্ঞানই পথ দেখায়। মার্চ, ২০২৪

১৩) তেজেশ অধিকারী : চিরস্মরণীয় রামরমণদা। নভেম্বর, ২০২৩

১৪) প্রদীপ চক্রবর্ত্তী : ক) তুমি নেই বলে (রামরমণ ভট্টাচার্য-কে মনে রেখে)। নভেম্বর, ২০২৩
খ) আকাশ কুসুম। মার্চ, ২০২৪

১৫) বসু রায় চৌধুরী : একটি কপোল - কল্পিত সংলাপ। মার্চ, ২০২৪

১৬) বিমল দেব : সন্দর্ভ বৃক্ষ। নভেম্বর, ২০২৩

১৭) বীথি কর : শরৎ বোস লেনের রোজনামচা। মার্চ, ২০২৪য

১৮) ভবানী শংকর চক্রবর্ত্তী : ক) প্রণতি। নভেম্বর, ২০২৩
খ) কবিতা শেষ, পড়ো। মার্চ, ২০২৪

১৯) ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু : বয়সের ভার ও আকুপাংচার। আগস্ট, ২০২৩

২০) ডা. মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত : ক) ক্রিটিক। মে, ২০২৩
খ) আকুপাংচার - যাত্রা হল শুরু। আগস্ট, ২০২৩
গ) ডা. নর্মান বেথুন আমাদের প্রেরণা। মার্চ, ২০২৪

২১) মৃণাল দত্ত : ক) রাণির পালা। এপ্রিল, ২০২৩
খ) শিশুমঙ্গল। মে, ২০২৩
গ) মানুষের কাছে। মে, ২০২৩
ঘ) সখ্য। জুন, ২০২৩
ঙ) শুভেচ্ছাবাণী। জুন, ২০২৩
চ) মণিপুর। আগস্ট, ২০২৩
ছ) সুকান্ত ২০২৩। সেপ্টেম্বর, ২০২৩
জ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ঝ) মৌনতার বিরুদ্ধে। অক্টোবর, ২০২৩
ঞ) অমল মানুষের কথা। নভেম্বর, ২০২৩
ট) ঈশ্বরের বরপুত্র। জানুয়ারি, ২০২৪
ঠ) কবির কাছে প্রার্থনা। জানুয়ারি, ২০২৪
ড) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। জানুয়ারি, ২০২৪

২২) সমীর কুমার ঘোষ : ক) এক মনোরম উপত্যকার মাঝে মদ্‌মহেশ্বর - ১ম পর্ব। এপ্রিল, ২০২৩
মে, ২০২৩
খ) শৈবতীর্থের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথে কিছুক্ষণ - সেপ্টেম্বর, ২০২৩
অক্টোবর, ২০২৩
নভেম্বর, ২০২৩
গ) সারান্ডার পথে। জানুয়ারি, ২০২৪
ঘ) শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত। মার্চ, ২০২৪

২৩) সচ্চিদানন্দ চৌধুরী : মাস্টার মশাই। নভেম্বর, ২০২৩

২৪) ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত : ক) ক্রনিক সর্দিকাশি থেকে রেহাই দিতে আকুপাংচার। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
খ) ঘাড়ের ব্যথা ও মাথাঘোরা কমাতে আকুপাংচার। মার্চ, ২০২৪

২৫) সন্দীপ জানা : অনন্ত। মার্চ, ২০২৪

২৬) সুচন্দন ব্যানার্জী : ক) যোশেফ সাহেবের কবর - জুন, ২০২৩
জুলাই, ২০২৩

২৭) সুদীপ্ত বন্দোপাধ্যায় : বৈরাগ্য। নভেম্বর, ২০২৩

২৮) স্নেহাংশু চাকদার : ক) স্বপ্নের দেশ আমেরিকা। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুষ্ঠিত পিকনিক। মার্চ, ২০২৪

শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত

(৪র্থ পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

আর জঙ্গল নেই। পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে পথ ঘরে ঘুরে উঠে গিয়েছে পাহাড় চূড়োর পানে। সবটাই চড়াই। টানা এই চড়াই ভাঙ্গা বেশ কষ্টদায়ক। পথে পাথরের আধিক্য কম। নরম মাটি একটু আঁঠা আঁঠা ভাব। বেশিক্ষণ হাঁটা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পা দুটো যেন ভারী হয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন পিছন থেকে টেনে ধরছে। দম নিতে বার বার দাঁড়াই। পিছন ফিরে সাথীদের দেখি সবাই দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। এক পা, এক পা করে এগোতে থাকি। পাহাড়টা একদম ন্যাড়া। একটাও গাছ নেই। মনে হচ্ছে ১১,০০০ ফুট উচ্চতা

অতিক্রম করেছি। আর কতটা পথ পেরোতে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। মালবাহেকেরা অনেক পিছনে, বাঁক ঘুরতে নীচের দিকে তাকাতে দেখি ওরা রবিদা আর শম্ভুদাকে হাত ধরে টেনে তুলছে পিছনে দুর্গম চড়াই পথে। মনে পড়ে একজন মালবাহক সকালে ঠাট্টাছলে বলেছিল "রুদ্রনাথকা চড়াই, জার্মানকা লড়াই"। এখন মিলিয়ে দেখছি সত্যিই তাই। তবে, লড়াই করে এগিয়ে গেলে এ পথের রূপটানা সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত মন ভরিয়ে দেয়। এদিকে মাথা তুলতে দেখি সকালের সেই নির্মেঘ নীলাকাশ ক্রমশঃ মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ডাকছে। ঠাণ্ডা দমকা বাতাস এসে মুখে লাগে। হয়ত বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলে ভীষণ বিপদে পড়ব। এই উচ্চতায় ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে আর যদি তুষারপাত হয় তাহলেও রেহাই নেই কারণ, বর্ষাতি রয়েছে নীচে মালবাহকের কাছে। বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত যাই ঘুটক না কেন এই ন্যাড়া পাহাড়ে দাঁড়াবার কোন স্থান নেই। আবার বৃষ্টি ভেজা পথে হাঁটাও খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এরকম অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকার যাতে না হতে হয়ে তা ভেবে একটা কথাই মাথায় এল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ পথটুকু অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে রুদ্রনাথ মন্দিরে। এদিকে হয়েছে কি আমাদের তেরোজনের দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আমরা যারা অগ্রবর্তী দলে আছি তারা স্বরূপা বৌদি, জয়াদি, দুলালী, রবি কর্মকার, সহযোগী ক্ষুদিরাম আর আমি। এহেন অবস্থায় মহিলা সদস্যদের অনুরোধ করলাম আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন হাঁটুন, আবহাওয়া ক্রমশ: খারাপ হচ্ছে। রাস্তায় একদম দাঁড়াবেন না। আস্তে হলেও এগিয়ে চলুন। পথে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে বৃষ্টি বা তুষারপাত হলে সকলেই বিপদে পড়ব। মহিলারা বললেন ঠিক আছে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব দ্রুত চড়াই ভাঙ্গতে। বলে, ওরা কয়েক কদম এগিয়ে যথারীতি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং হাঁফাতে থাকেন। ৫ মিনিট চড়াই ভেঙ্গে ২ মিনিট বিশ্রাম। বুঝতে পারছি ওদের শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। এখন আমরা প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চতার কাছাকাছি চলে এসেছি। জুনিপারের ঝোপ অনেক নীচে দেখেছি। এ অঞ্চলে বড় বড় পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। শুনেছি এই পাহাড়ের উপর নওলা পাস (১৪৬১২ ফুট) অতিক্রম করে নামতে হবে রুদ্রনাথে (১১৬৭০ ফুটে)। প্রকৃতিরাণী এতক্ষণ আকাশে ভাসিয়ে রেখে ছিলেন মেঘের ভেলা। নীল আকাশের বুকে কত বিচিত্র রূপে তারা উড়ে বেড়াচ্ছিল। এখন আমরা এসে পড়েছি তাদের দেশে। আকাশের সেই মেঘ ক্রমশ: ঘন হয়ে নেমে আসছে পাহাড়ের গায়ে, মেঘের চাদরে সব ঢেকে যাচ্ছে, বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না, এমনকি পরস্পর পরস্পরকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না। মেঘের দেশে সকলে হারিয়ে যাই। মেঘের সোঁদা গন্ধে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে কি করণীয় বুঝতে পারছি না। আমার হিমালয় ভ্রমণ এই প্রথম, অভিজ্ঞতার ঝুলি এক্কেবারে খালি। রবি কর্মকার ও ক্ষুদিরামকে বলি, তোমরা দুজন মহিলার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দাও, আমিও একজনকে সাহায্য করছি, সকলকে দ্রুত কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে। যদি কেউ থামতে চায়, থামতে দিও না, শুধু এগিয়ে চল, মেঘ ডাকছে, কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে। আর ওদের বোঝাচ্ছি সামনের বাঁকটা পেরোলেই মনে হচ্ছে পথ শেষ হবে তখন বিশ্রাম নেবেন। এভাবেই সামান্য পথ বাকীর গল্প করতে করতে কখনও ওদের হাত ধরে, কখনওবা পিছন থেকে ঠেলে দুর্গম চড়াই পথ অতিক্রম করছি। সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে, হাঁপাচ্ছি। এসময় জয়াদি ও স্বরূপাবৌদি হাত জোড় করে বলেন সমীর আর হাঁটতে পারছি না, এখন না দাঁড়ালেই নয়, মাথা ঘুরছে মনে হচ্ছে পড়ে যাব। দেখি মহাবিপদ, এ অবস্থায় হাত ছাড়া যাবে না। বলি দু মিনিট দাঁড়াব ওরা বলেন আর একটু সময় দাও। ঠিক এক মিনিট পরেই বলি সময় হয়ে গেছে এবার চলুন। "ভোলা বাবা পার করেগা" বলে ঠেলে তুলি দুরন্ত চড়াই

পথে। এত কষ্টের মধ্যেও ওরা হেসে ফেলেন। এভাবে কিছু পথ চলার পর লক্ষ্য করি স্বরূপাদি শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ওনার শীতবস্ত্র রয়েছে অনেক নীচে মালবাহকের পিঠে। অগত্য কোনো উপায় নেই দেখে আমার পুল ওভার সোয়েটার খুলে তুলে দিই ওনার হাতে, বলি পরে নিন। উনি আমার সোয়েটার নিতে রাজী হন না, আমার কথা ভেবে বলেন— এই ঠাণ্ডায় তুমিও যে কষ্ট পাবে। এবার বুলাদি বলেন আমার কান ভোঁ ভোঁ করছে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তখন আমার হনুমান টুপিটা মাথা থেকে খুলে ওনাকে দিই কান ঢাকার জন্য। বলি আমার জন্য চিন্তা করবেন না, আপনারা শুধু দয়া করে এগিয়ে চলুন।

পথ বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই পৌঁছে গেলাম পাহাড় চুড়োয়, নওলা পাস টপে (১৪, ৬১২ ফুট)। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বিশাল উপত্যকা। স্থানে স্থানে শীতের টানা তুষারপাতের বরফ জমে শক্ত হয়ে রয়েছে, এখনো গলেনি। কিছু পথ বরফে ঢাকা। তবে পথ রেখা কোনো কোনো স্থানে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে দুটি পথ গিয়েছে দু দিকে। এখন আমরা কোন পথ ধরব ডানদিকের না বাঁদিকের। রবি কর্মকার কুণ্ডু স্পেশালের যাত্রী নিয়ে কেদার-বদরী এসেছেন বহুবার। আমার মতো আনকোরা নতুন নয়, উনি এ পথে ইতিপূর্বে কখনও আসেননি, পথশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটা নিয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়েন বলেন কিছুই বুঝতে পারছি না এখানে অপেক্ষা করা যাক্ মালবাহকরা না আসা পর্যন্ত। ওরা এলে তখন এগোন যাবে। আমি বলি ওদের অপেক্ষায় থাকলে সন্ধ্যা নেমে অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন আরও অসুবিধায় পড়ব বরং আমি আর ক্ষুদি একটু এগিয়ে দেখি রাস্তার সন্ধান পাই কিনা। এই সময় জয়াদি সাইড ব্যাগ থেকে গোটা কতক বিস্কুট বের করেন। বিস্কুট ছিল মোট ছটা। অনেক খুঁজেও আর কোনো খাবার কারও ব্যাগে পাওয়া গেল না। নিমকী, চানাচুর, বাদাম বিস্কুট সবই রয়েছে মালবাহকদের জিম্মায় অনেক পিছনে। সে যাক্ ছ-পিস ব্রিটানিয়া থিন আমরা ছ-জন ভাগ করে নিলাম। বিস্কুট খেয়ে আমার ব্যাগ থেকে পঞ্চকেদারের ম্যাপটা বের করি। কিন্তু ম্যাপ দেখে কিছু বুঝতে পারি না। এমতাবস্থায় একটু চিন্তা করে বলি— শোন, কপাল ঠুকে বাঁদিকের পথটা ধরেই এগোব, দশ মিনিট এগিয়ে পথের দিশা পেলে ভাল, না হলে আবার এখানেই ফিরে আসব। সবাই রাজী হয়।

উৎরাই পথ ধরে কয়েক কদম এগোনরপর ক্ষুদিরাম চেঁচিয়ে ওঠে "ভালুক" "ভালুক" বলে। দেখি প্রায় ৫০ গজ দূরে একটা বিশাল ভালুক উঠে আসছে আমাদের দিকে। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে। ক্ষুদিরামের চিৎকার, চেঁচামেচি, লম্ফ-ঝম্ফ দেখে বনচরটি ঘাবড়ে গেছে, চকিতে ঘুরে নীচের জঙ্গলের পথ ধরে নেমে যায়, মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখে তারপর, রডোডেনড্রন জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যায়। পাহাড় জঙ্গলের মাঝে এই প্রথম ভালুক দেখার এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পেরে আমি ধন্য। পথে ভালুক দেখে আনন্দ যেমন হল পরমুহূর্তে ভয়ও হচ্ছে সন্ধ্যার সময় অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীর সামনে পড়লে কী হবে? শুনেছি এই অঞ্চলটা অর্থাৎ উখিমঠ থেকে যোশীমঠ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটা কেদারনাথ স্যাংচুয়ারির অন্তর্গত। ৯৬৭ বর্গ কিমি বিস্তৃত স্যাংচুয়ারিতে চিতা, বরফচিতা, ভালুক, হরিণ, কস্তুরীমৃগ ছাড়াও নানান বন্য জন্তুর বাস। তাই ঠিক করি সবাই একসাথে পথ চলব।

এখন সমস্ত পথটাই উৎরাই। পথে প্রচুর শক্ত বরফ জমে রয়েছে। এর উপর দিয়েই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছি। আর লক্ষ করছি এ পথে মানুষের পদচিহ্ন দেখা যায় কিনা। দেখি অসংখ্য তৃণভোজী প্রাণীর পদচিহ্ন। দু পাশে রডোডেনড্রন গাছের গভীর জঙ্গল। ফুল ফুটেছে পিঙ্ক রঙের। প্রকৃতির আপন খেয়ালে পাহাড়ের এদিকে গুড়ে উঠেছে ফুলের জঙ্গল আর নওলা পাসের ওপরে হানসা বা হামসু বুগিয়ালের ঠিক

নীচে ছিল বিশাল বিশাল বনস্পতির সমারোহ। ফুলময় এই জঙ্গলই যেন আর এক পুষ্পবটিকা বা ফুলের বেড। পাহাড়ের ঢালে কত রকম ফুলের সমাবেশ। যেন ফুলের জলসা। এরকম ফুল ইতিপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। লম্বা পাতাওয়ালা গাছে ফুটে রয়েছে থোকা থোকা নানা বর্ণের ফুল। হাওয়ায় তারা দেল খেয়ে পরস্পরের গায়ে কেমন এলিয়ে পড়ছে। হাওয়ায় দোল খেয়ে আমাদের শরীরে মিষ্টি, মধুর স্পর্শের ছোঁয়াচ রেখে গেছে। দুহাতে গাছ সরিয়ে পথ করে তবেই এগোতে পেরেছি। প্রকৃতির এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। আর এখন পিঙ্ক আর সাদা রঙের রডোডেনড্রন ফুলের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছি। এ ফুলও এই প্রথম দেখলাম। মন ভরে গেল। পথ কষ্ট নিমেষে উধাও হয়ে পথ চলায় পাই নতুন উদ্যম। এমনই হিমালয়ের মহিমা। পথে পড়ল বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গ্লেসিয়ার। সাবধানে লাঠি ঠুকে পার হয়ে গেলাম। নরম কাদায় এই প্রথম চোখে পড়ল হান্টার জুতোর ছাপ। বুঝতে পারছি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। উৎরাই পথে প্রায় ৩ কিমি হাঁটার পর বহুদূরে পাহাড়ের ঢালে দেখতে পেলাম রুদ্রনাথজী মন্দিরের পতাকা উড়ছে। পিছিয়ে থাকা সহযাত্রীদের হাত নেড়ে ডাকি, দেখাই কাছেই মন্দির, দ্রুত চলে আসুন। রুদ্রনাথ পাহাড়ে উঠবার মুখে পড়ে নারদশিলা। ভগবান নারায়ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ঋষিবর নারদ ঠাকুরের মূর্তির পাশেই রয়েছে নারদ কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলই একমাত্র ভরসা পিপাসা মেটানর জন্য। নারদ শিলা থেকে ১ কিমি দূরে রুদ্রনাথ মন্দির। এই ১ কিমি পথে জলের কোনো উৎস নেই। শেষ পথটুকু সামান্য চড়াই। দ্বিগুন উৎসাহে দ্রুত পথটুকু অতিক্রম করে সোয়া সাতটায় আলো থাকতে থাকতে পৌছে যাই মন্দির প্রাঙ্গণে। পুরোহিত সাথে সাথে ঘর দেখিয়ে দেয় রাত্রিবাসের জন্য। ঘর দেখে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে থাকি সঙ্গী সাথীদের অপেক্ষায়। পাঁচজন সহযাত্রী এলেন মিনিট কুড়ি পর। ওরা পৌছতে দরজা, জানালাবিহীন খড়ে ছাওয়া একটি ঘর দেখিয়ে দিই। ঘরের মেঝে খড় বিছান ছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত-শান্ত সঙ্গীরা শরীরটা এলিয়ে দেয় খড় বিছান বিছানার উপর। পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে চায়ের ব্যবস্থা করি। এদিকে ক্ষুদিরাম একটা বড় গামলা যোগাড় করে জল ফুটাতে লেগে গেছে। এতে ঘরটা একটু গরম হয় আর আমরাও পাই পানের জন্য গরম জল। পুরোহিত ঠাকুর ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসে বসেন, জুড়ে দেন নানান গল্প। ওনাকে চা, সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ণ করলে খুশী হন। পরে কথা প্রসঙ্গে অনুরোধ করি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য। উনি আমাদের অবস্থা বুঝে দয়াপরবশ হয়ে বলেন ঠিক হ্যায় বেটা রোটী ম্যায় পাকাতা হুঁ, তুমলোগ সবজি বানানেকা বন্দোবস্ত কোর। মালবাহক সমেত আমরা এসেছি মোট ১৩ জন। সেই রাত্রে পুরোহিত মহাশয় ১৩ জনের প্রয়োজনীয় রুটি প্রস্তুত করে আমাদের খাওয়ালেন। তাঁর এই আতিথেয়তার কথা কোনদিন ভোলার নয়। কথা প্রসঙ্গে জানলাম এই দুর্গম পার্বত্য মন্দিরে পুরোহিত ও তাঁর সেবক এখানে থাকেন টানা ছয় মাস। এঁদের সারা মাসের রেশন আনতে হয় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মণ্ডল বা সাগর চটী থেকে। সেই কষ্টার্জিত খাদ্য ভাণ্ডার থেকে সানন্দে আমাদের ১৩ জনকে খাওয়ালেন। এঁদের এই অতিথিবৎসল চরিত্রের পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমরা মুগ্ধ। এখানেই শেষ নয়, ওনার সেবককে দিয়ে ১ কিমি দূরে অবস্থিত নারদ কুণ্ড থেকে পানীয় জল আনিয়ে দিলেন ওই রাত্রে।

রাত ৮টায় একজন মালবাহক কম্বলের প্যাকেটটা নিয়ে এসে বলল ওরা আসছে, একটু দূরে আছে, সঙ্গে তিনজন মালবাহক আছে, কোনো চিন্তা কোর না, ঠিক এসে যাবে। খবর পেয়ে দুশ্চিন্তা দূর হয়। রাত ৮-৩০ টায় দূরের পাহাড়ে টর্চের আলো দেখে বুঝলাম সহযাত্রীরা আসছেন। ঘরে একটা প্রদীপ ছিল সেটা

নাড়িয়ে সিগন্যাল দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হল না। প্রচণ্ড বাতাসে বার বার প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। রাত প্রায় ৯-৩০ টায় দলের বাকী তিন সদস্য তাঁদের প্রচণ্ড-ক্লান্ত শরীরটাকে টানতে টানতে কোনো রকমে এসে পৌঁছল মন্দির প্রাঙ্গণে। ঠাণ্ডায় ওঁরা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি গায়ে কম্বল জড়িয়ে গরম চল, চা দিই। পরে রুটি, সবজি কোনরকমে গলাধ:করণ করে এই ছোট্ট ঘরে ১৩ জন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত, পা গুটিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে বা বসে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে খড়ের বিছানা ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারারাত ঘুম হয়নি। তবুও বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। ঘরের বাইরে এসে দেখি চোখের সামনে ঝলমল করছে তুষারাবৃত নন্দাদেবী পর্বতমালা। অপূর্ব সুন্দর। নন্দাদেবীর রূপোর মুকুট সূর্য কিরণে ঝক্‌মক্ করছে, তাকানো যাচ্ছে না। রবিদা বলেন ওই দ্যাখ ত্রিশূল পর্বতমালা। তিনটি চূড়ার জন্য এরকম নাম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে হাতি পর্বত ও নন্দাঘুন্টি। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে দেখছি নীল আকাশের নীচে পর পর এতগুলো চির তুষারময় পর্বতশৃঙ্গ। এ এক দুর্লভ দৃশ্য; যা কোনও দিন ভোলার নয়। গতকাল জঙ্গলের পথে কোনো পর্বতমালা চোখে পড়েনি। আজ ভোরের আলোয় নয়ন ভরে দেখি। পুরোহিত ঠাকুর বলেন— একটু নীচে রয়েছে ছোট্ট বৈতরনী নদী, যাদি আপনারা যেতে চান তাহলে চলুন আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। কুণ্ডের পাশে নারায়ণের অনন্ত শয্যায় শয়নের একটি সুন্দর মূর্তি, পদতলে লক্ষ্মী আর নাভিকমলে ব্রহ্মা বিরাজমান। এখানে কেউ কেউ তর্পনাদি ক্রিয়াকলাপ করে থাকেন। আরও বলেন— এই পাহাড়ের উপর দিকে মাইল তিনেক গেলে পাণ্ডব সার বা পাণ্ডব চোলায় পাণ্ডবদের পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র দেখা যায়। জনশ্রুতি পাণ্ডবদের অস্ত্র ভাণ্ডার ও ধনাগার এখানে ছিল।

ধূপ জ্বালিয়ে সকলে মন্দিরে পুজো দিলাম। পুরোহিত রুদ্রনাথের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে বলেন— কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধের পর আত্মীয়-পরিজন নিধনের মহাপাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে পাপস্খালনের জন্য হিমালয়ে আসেন দেবাদিদেব শিবশম্ভুর দর্শনের জন্য। এদিকে অন্তর্যামী ভোলা মহেশ্বর তাদের দর্শন দিতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং দেখা দিতে অস্বীকার করে পালাতে থাকেন পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে। নাছোড়বান্দা পঞ্চপাণ্ডবও পিছু নেন শিবের। শিব তখম মহিষরূপ ধারণ করে পালাতে থাকেন। আকস্মাৎ মহাবলী ভীমসেন পিছন থেকে জাপ্টে ধরেন মহিষরূপী শিবের পশ্চাদভাগ কেদারে। মহিষরূপী শিবের অঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে— কেদারে পশ্চাদভাগ, মদ্‌মহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে জটাজুট মুখ, কল্পেশ্বরে জটা। গাড়োয়াল হিমালয়ের এই পাঁচ পুণ্যভূমি, পবিত্র হিন্দু তীর্থক্ষেত্র পরিচিত হয়েছে পঞ্চকেদার নামে। লোকশ্রুতি, পাণ্ডবরাই এই পাঁচ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ধূসর রঙা পাথরের ছোট গুহা মন্দিরের বিগ্রহ বলতে জটাজুট মুখমণ্ডল, লিঙ্গ স্বরূপ। পুজো শেষে পুরোহিত সবার কপালে জয়টীকা পরিয়ে আশীর্বাদ করেন। দেবাদিদেব মহেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা করি। জানিয়ে রাখি ফি বছর দীপাবলী থেকে অক্ষয় তৃতীয়া দেবতা রুদ্রনাথ (৩৬০০ মিটার) থেকে নেমে এসে আসীন হন গোপেশ্বরে (১৩০৮ মি:)।

ইতিমধ্যে, ক্ষুদিরামের ভাত, ডাল, তরকারী রান্না হয়ে গেছে। ভোজন পর্ব শেষে আমরা যাত্রা শুরু করি সাড়ে ৯টায়। ১ কিমি উৎরাইয়ের পর শুরু হল চড়াই। সকালের নরম রোদে চড়াই ভাঙ্গতে তেমন কষ্টা হয় না। পথের দুপাশে যত দুর দেখা যায় শুধু রডোডেনড্রন গাছের ঝোপ। প্রতিটি গাছ ফুলে ভরে গেছে।

পিঙ্ক আর সাদা রডোডেনড্রন ফুলের ভারে গাছের ডাল-পালা নুয়ে পড়ছে। একটু ফাঁকা হতে দেখি ঘাসের মধ্যে ফুটে রয়েছে নানান বর্ণের ছোট ছোট অ্যালপাইন ফুল। তারা পরমানন্দে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। পথে অসংখ্য বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্থানে স্থানে বরফ জমে রয়েছে। এখন প্রায় ৪ কিমি চড়াই পথ পেরিয়ে এসেছি। আজ অনসূয়ার পথ না ধরে, সোজা নেমে যাব সাগরের পথে। এ পথ PWD গড়েছে বোল্ডার বিছিয়ে। প্রায় ৬ ফুট চওড়া রাস্তা। বোল্ডার বিছান নড়বড়ে পাথরে সাবধানে পা রেখে সবাই নামতে থাকি সাগর চটীর উদ্দেশ্যে। রুদ্রনাথ থেকে সাগরের দূরত্ব ২০ কিমি। মণ্ডল থেকেও তাই। পথে পড়ল তিনটি সুন্দর বুগিয়াল। পানার বুগিয়াল থেকে চৌখাম্বা পর্বতমালা ভারী সুন্দর দেখা যায়। সবকটি বুগিয়ালেই একটু বসি, বিশ্রাম নিই। ২০ কিমি পথের বেশিরভাগটাই উৎরাই পথ, এই পথটুকু অতিক্রম করে সাগর চটীতে পৌঁছতে লাগল প্রায় ৯ ঘণ্টা। কারণ, দুলালীর হাঁটু লক হচ্ছে। হাঁটু ভাঁজ করতে পারছে না। উৎরাই পথে হাঁটুতে চাপ পড়ে বেশি, পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। সারাটা উৎরাই পথ দুলালীকে ধরে ধরে নামাতে গিয়ে সময় একটু বেশি লেগেছে। সহযাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনার ব্যস্ততায় এ পথের প্রতিটি বাঁকের, প্রতিটি বুগিয়ালের মনমাতানো অফুরন্ত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয় অনেক সময়। সে যাক্, কথায় বলে যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। রোমাঞ্চে ভরা দুর্গম এই তীর্থযাত্রা সেরে দলের সকলকে নিয়ে ফিরে আসি সাগরে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়।

সতর্কতার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকাই কিছু দেখা যায় না বুঝি পিছনের সহযাত্রীর পদশব্দ এটি। এভাবেই এগোতে এগোতে প্রায় পাঁচটার সময় দেখি জঙ্গল হাল্কা হয়েছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়, আর তেমন জঙ্গল নেই।

রামমোহন মিশন ও আমরা

স্নেহাংশু চাকদার

১৩ মার্চ ২০২৪ বুধবার বিকালে ডা. নর্মান বেথুনের জন্মবার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পেলব মুখার্জী। অনুষ্ঠানে রামমোহন মিশনের সভাপতি রামমোহন মিশন স্কুলের প্রিন্সিপাল সুজয় বিশ্বাসকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি পেলব মুখার্জী উত্তরীয়, ফুলের স্তবক ও মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে সুজয় বিশ্বাসকে সম্মাননা জানান। সম্পাদক তাঁর প্রণীত দুখানি বই শ্রীবিশ্বাসের হাতে তুলে দেন। প্রতিদানে সুজয়বাবু রামমোহনের একটি প্রতিকৃতি ও দুটি গ্রন্থ সভাপতির হাতে অর্পণ করেন।

সম্পাদক গৌতম রায় চৌধুরী, তাঁর জীবনপঞ্জীসহ কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন সুজয় বিশ্বাস আমাদের আপনজন। রামমোহন মিশন বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ এবং আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর তিনি রামমোহন মিশন-এর সভাপতির

দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিনি রামমোহন মিশন-এর কাজের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এর পর সুজয় বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন বেথুন ইন্সটিটিউটের সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আপনারা এই বয়সে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন তা অভাবনীয়। তিনি বলেন আমার পিতা শংকর বিশ্বাস রামমোহন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। রামমোহন মিশন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। বর্তমানে স্কুলে ৩০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। রামমোহন মিশনের মাধ্যমে হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছি। নাবালিকা-বিবাহ, পণপ্রথা, শিশু-শ্রমিক, গার্হস্থ্য হিংসার বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামসহ নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। তাছাড়া আর্থিকভাবে দুর্বল লোকেদের-ও যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের কাজের প্রশংসা করেন। প্রয়োজনে তিনি আমাদের কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যথাসাধ্য সাহায্যের কথা ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন। সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের পরিচালক গৌতম রায় চৌধুরী বলেন সুজয় বিশ্বাসকে সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। আশা করব তিনি আমাদের পাশে থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবেন।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা

২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা

৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা

৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা

৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা

৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in